ফয়যানে মদীনা

জুন ২০২২

আসমান ও জমিনবাসী সবাই আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী

প্রিয় নবীর সম্মান ও মর্যাদা



ভুল স্বীকার

তবে কোনটি সঠিক?

নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ!

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

শিশুদের দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

Presented by :
Translation Department (Dawat-e-Islami)

ফয়যানে মদীনা

জুন ২০২২

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা

দেখতে থাকুন

আসমান ও জমিনবাসী সবাই আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী

মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِؕ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَاْنٍ ﴿۲۹﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তাঁরই নিকট প্রার্থনা করছে যতকিছু আসমান সমূহ ও জমিনে রয়েছে। প্রত্যহ তার একেকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কাজ রয়েছে। (পারা ২৭, সূরা আর রহমান, আয়াত ২৯)

তাফসীর: আয়াতে বলা হয়েছে, আসমানে অবস্থানকারী ফিরিশতা হোক বা জমিনে বসবাসকারী জ্বিন, মানুষ বা কোন সৃষ্টি, উচ্চ হোক বা নগন্য, কোন কিছুই **আল্লাহ পাকের** অমুখাপেক্ষী নয়, বরং সবাই **তাঁর** দয়ার মুখাপেক্ষী। আর (পারিপার্শ্বিক) অবস্থা ও মুখের ভাষায় **তাঁরই** দরবারের মুখাপেক্ষী। এই আয়াতে **আল্লাহ পাকের** কুদরতের উৎকর্ষতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যেক সৃষ্টি সে যত বড়ই হোক না কেন, সে তার প্রয়োজনীয়তা নিজ থেকে পূরণ করতে অপারগ আর **আল্লাহ পাকের** প্রতি মুখাপেক্ষী। (খাযিন, আর রহমান, ২৯নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/২১১। জালালাঈন, আর রহমান, ২৯নং আয়াতের পাদটীকা, ৪৪৪ পৃষ্ঠা)

আসমানবাসীদের মধ্যে জিব্রাঈল ও মিকাঈল, আরশ বহনকারী, নৈকট্যশীল এবং অন্যান্য সকল ফিরিশতা অন্তর্ভূক্ত আর জমিনবাসীদের মধ্যে আম্বিয়া ও আউলিয়া, সাহাবা ও অন্যান্য সকল মুমিন নরনারী অন্তর্ভূক্ত, বরং **আল্লাহ পাকের** দরবারে মুখাপেক্ষীদের মধ্যে তো মুশরিক ও কাফেরাও অন্তর্ভূক্ত, অনুরূপভাবে পশুপাখি ও উদ্ভিদের ফরিয়াদ পূরণও এই পবিত্র দরবার থেকেই হয়ে থাকে। অতএব সকল মানুষ, পশু এবং মাটির জীবদের ব্যাপারে ইরশাদ করা হয়েছে: وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন বিচরণকারী নেই, যার জীবিকা **আল্লাহর** করুণার দায়িত্বে নয়। (পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ৬)

আসমান ও জমিনবাসীর তাসবীহ ও সকল কিছুর **প্রতিপালকের** হামদ ও পবিত্রতা বর্ণনা করার আলোচনা কুরআনে মজীদে কিছুটা এভাবে রয়েছে। "**তাঁরই** পবিত্রতা



ঘোষণা করে সপ্ত আসমান ও জমিন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যে রয়েছে এমন কোন বস্তু নেই, যা তার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করে না; হ্যাঁ, তোমরা সেগুলোর তাসবীহ অনুধাবন করতে পারো না।। নিশ্চয় **তিনি** সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" (পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৪৪) এবং মনে রাখবেন, মুখাপেক্ষী সৃষ্টিকূলের তাসবীহও দোয়া ও প্রার্থনাই।

আসমানবাসীদের মধ্যে খুবই উচ্চ মর্যাদার আরশ বহনকারী ফিরিশতারা আরশের মালিকের নিকট এভাবেই ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে আছে। কুরআনে পাকে ইরশাদ করা হয়েছে: আরশ বহনকারী ও এর চতুপার্শ্বে বিদ্যমান (ফিরিশতারা) আপন **রবে**র প্রশংসা সহকারে **তাঁর** পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং **তাঁর** উপর ঈমান আনে আর মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের **প্রতিপালক**! তোমার দয়া ও জ্ঞান সবকিছুকেই পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো, যারা তাওবা করেছে ও তোমার পথ অনুসরণ করেছে এবং তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করে নাও। (পারা ২৪, সূরা মুমিন, আয়াত ৭)

জমিনবাসীরাও সবাই **আল্লাহ পাকের** দরবারের মুখাপেক্ষী, এর মধ্যে উত্তম মনিষী হলেন আম্বিয়াগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام, তাঁদের **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আবেদন, ফরিয়াদ, প্রার্থনা ও দোয়া অবলোকন করুন।

(১) আবুল বশর, সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর ক্ষমার জন্য আরয করেন: হে আমাদের **প্রতিপালক**! আমি নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। সুতরাং যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো ও আমাদের প্রতি দয়া না করো, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

(পারা ৮, সূরা আরাফ, আয়াত ২৩)

(২) হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام জাতির অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে নিজের ফরিয়াদ **আল্লাহ পাকে**র দরবারে এভাবে উপস্থাপন করেন: আমি পরাস্ত, তুমি আমার বদলা নাও! (পারা ২৭, সূরা ক্বমর, আয়াত ১০)

(৩) হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام হিকমত ও **আল্লাহ** পাকের নৈকট্য লাভের জন্য এভাবে আরয করেন: হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে হিকমত দান করো ও আমাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করে দাও যারা তোমার বিশেষ নৈকট্যের অধিকারী বান্দা। (পারা ১৯, সূরা আশ শু'রা, আয়াত ৮৩) আর নিজের আমলের কবুলিয়্যতের জন্য আরয করেন: হে আমাদের **প্রতিপালক**! আমাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করো, নিশ্চয় তুমিই শ্রোতা, জ্ঞাতা। (পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৭) মক্কায়ে মুকাররমার জন্য এই দোয়া করেন: হে আমার **প্রতিপালক**! এ শহরকে নিরাপদ করে দাও এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে প্রতীমা পূজা থেকে বিরত রাখো। (পারা ১৩, সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ৩৫) কিয়ামতের দিন নিজের ও নিজের পিতামাতা তাছাড়া ঈমানদারদের ক্ষমার জন্য এভাবে প্রার্থনা করেন: হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে ক্ষমা করো ও আমার মাতা-পিতাকে ও সমস্ত

মুসলমানকে, যেদিন হিসাব ক্বায়েম হবে। (পারা ১৩, সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ৪১)

(৪) হযরত লূত عَلَيْهِ السَّلَام জাতির প্রতি অতিষ্ট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে **আল্লাহ পাকের** সাহায্যের জন্য আরয করেন: হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে সাহায্য করো এসব অশান্তি সৃষ্টিকারী লোকের বিরুদ্ধে। (পারা ২০, সূরা আনকাবুত, আয়াত ৩০)

(৫) হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام কষ্ট ও যন্ত্রণা এবং পীড়া ও অসুস্থতায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার পর **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরোগ্যের আবেদন করেন: নিশ্চয় আমাকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করেছে আর তুমি সমস্ত দয়ালুদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু। (পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৩)

(৬) হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام সমুদ্রের গভীরে, মাছের পেটে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থলের দরবারে মুক্তির জন্য এভাবে আরয করেন: কোন মাবুদ নেই তুমি ব্যতীত; পবিত্রতা তোমারই, নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে। (পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৭)

(৭) হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام মাদায়েন পৌঁছে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়ার জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করেন: হে আমার **প্রতিপালক**! আমি ঐ খাদ্যের মুখাপেক্ষী, যা তুমি আমার জন্য অবতীর্ণ করেছো। (পারা ২০, সূরা কিসাস, আয়াত ২৪) অতঃপর নবুয়ত দান করার পর সেই মহান পদমর্যাদার দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করার জন্য এই দোয়া করেন: হে আমার **প্রতিপালক**! আমার জন্য আমার বক্ষ খুলে দাও ও আমার জন্য আমার কর্ম সহজ করে দাও! আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (পারা ১৬, সূরা ত্বা'হা, আয়াত ২৫-২৮)

(৮) হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** নিকট নিজের জন্য মহান সম্রাজ্যের দোয়া করেন: হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে ক্ষমা করো ও আমাকে এমন রাজ্য দান করো, যা আমার পর কারো জন্য উপযোগী না হয়, নিশ্চয় তুমি মহান দাতা। (পারা ২৩, সূরা সোয়াদ, আয়াত ৩৫)

(৯) হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের জন্য ঐ সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার নিকট আবেদন করেন: হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে তোমার পক্ষ থেকে প্রদান করো পবিত্র সন্তান। নিশ্চয় তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী। (পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৮) আর বলেন: হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে একা রেখো না আর তুমি সর্বাধিক উত্তম ওয়ারিস (মালিক)। (পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৯)

(১০) হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام জাতির আবেদনে আসমান থেকে খাবার ভরা দস্তর খানার জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করেন: হে **আল্লাহ পাক**, হে **প্রতিপালক**! আমাদের উপর আকাশ থেকে একটা 'খাদ্য-ভর্তি খাঞ্চা' অবতীর্ণ করো, যা আমাদের জন্য ঈদ (আনন্দ-উৎসব) হবে আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য এবং তোমার নিকট থেকে নিদর্শন; ও আমাদেরকে রিযিক দান করো আর

তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। (পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ১১৪)

(১১) রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া কুরআনে মজীদেও উল্লেখ রয়েছে আর হাদীসে পাকে তো এতবেশি রয়েছে যে, ওলামায়ে কিরাম এই দোয়া সম্বলিত বেশ কয়েকটি পৃথক কিতাব রচনা করেছেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরয করেন: হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে অধিকহারে জ্ঞান দান করো। (পারা ১৬, সূরা ত্বা'হা, আয়াত ১১৪) হে আমার **প্রতিপালক**! ক্ষমা করো ও দয়া করো এবং তুমি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (পারা ১৮, সূরা মুমিনুন, আয়াত ১১৮)

এবার এই সকল আয়াতের আলোকে সূরা রহমানের আয়াত يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَاْنٍ ﴿۲۹﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাঁরই** নিকট প্রার্থনা করছে যতকিছু আসমান সমূহ ও জমিনে রয়েছে। প্রত্যহ তার একেকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কাজ রয়েছে। (পারা ২৭, সূরা আর রহমান, আয়াত ২৯) পাঠ করুন এবং ভালবাসা ও মহত্বের কল্পনায় ডুবে যান আর **আল্লাহ পাকের** দরবারে হাত তুলে দোয়া প্রার্থনা করুন। **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য করুক। اٰمِين



ধারাবাহিক পর্ব:
সবার উর্ধ্বে ও সেরা আমাদের নবী (১৬ তম পর্ব)
পূর্বে প্রকাশিত হওয়ার পর

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদব ও সম্মান

আবুল হাসান আত্তারী মাদানী

সম্মানিত হওয়ার একটি দিক এটাও যে, দ্বীনের শত্রুরা **তাঁর** প্রতি আপত্তি করলো তো স্বয়ং **আল্লাহ পাক** প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন, একবার অহী অবতীর্ণে কিছুদিন বিরতি ছিলো তখন মুশরিকরা বললো: **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **প্রতিপালক তাঁকে** ছেড়ে দিয়েছে, তখন **আল্লাহ পাক** মুশরিকদের প্রত্যুত্তরে পূর্ণ একটি সূরা অবতীর্ণ করে দেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য ঘোষণা করে দিলেন যে, **হে মাহবুব!** আপনার **প্রতিপালক** আপনাকে ছাড়েনি। (মুসলিম, ৭৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৬৫৬)

উমাইয়া বিন খালাফ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তার ব্যাপারে কুৎসা রটাতো, **আল্লাহ পাক** তার ও তার মতো অন্যান্যদের প্রত্যুত্তরে সম্পূর্ণ সূরা হুমাযাহ অবতীর্ণ করে দেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১৪১ পৃষ্ঠা)

আবু লাহাব ও তার স্ত্রী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দিতো তখন **আল্লাহ পাক** উভয়ের প্রত্যুত্তর এবং খারাপ পরিণতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ করে দিলেন। (৩০তম পারা, সূরা লাহাব)

ওয়ালিদ বিন মুগীরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গালমন্দ করলো তখন **আল্লাহ পাক আপন মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এতো সম্মানিত করলেন যে, ওয়ালিদ বিন মুগীরার প্রত্যুত্তরে কুরআনে করীমের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ করে দিলেন এবং তার অপকর্ম সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দিলেন, এমনকি তার জারজ সন্তান হওয়ার বিষয়টাও প্রকাশ করে দিলেন। (২৯তম পারা, সূরা কলম, আয়াত ১৩) অপর এক স্থানে এটাও ঘোষণা করে দিলেন, যে **আমার মাহবুবের** শত্রু, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। (৩০তম পারা, সূরা কাওসার, আয়াত ৩) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখার ওয়াদা করলেন। (৬ষ্ট পারা, আল মায়েদা, আয়াত ৬৭)



রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ থেকে বের হওয়া বাক্যকেও **আল্লাহ পাক** এতো সম্মানিত করেন যে, "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝" (২৭তম পারা, আন নজম, আয়াত ৩,৪) বলে **তাঁর** বাণীকে নির্ভরযোগ্য করে দিলেন, যাতে কেউ **মাহবুবের** এই বাক্যকে অস্বীকার করতে না পারে।

মাহবুবের সাথে সম্পর্কিত সকল কিছুকেই সম্মান ও মর্যাদা দান করা হয়েছে, যাঁরা **তাঁর** সাহাবী হয়ে গেছেন, তাঁদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। (৫ম পারা, আন নিসা, আয়াত ৯৫।

মাহবুবের সম্মান ও আদবের কারণে **তাঁর** স্ত্রীদেরও জগতের মহিলাদের চেয়ে আলাদা মর্যাদা দান করেছেন এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, নবীর স্ত্রীরা সাধারণ মহিলাদের মতো নয়। (২২তম পারা, আল আহযাব, আয়াত ৩২)

মাহবুবের সম্মান ও মর্যাদা অর্থাৎ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত স্ত্রীর উপর অপবাদ লাগানো হলে তবে **আল্লাহ পাক তাঁর** পবিত্রতার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন। (১৮তম পারা, আন নূর, আয়াত ১১)

অনুগ্রহ ও মর্যাদার বর্ষণ শুধু জাহেরী হায়াতে মুবারাকাতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং দুনিয়া থেকে পর্দা করার পরও অব্যাহত রয়েছে। সকাল ও সন্ধ্যায় সত্তর হাজার (৭০,০০০) করে ফিরিশতাকে শুধু দরূদ ও সালাম আরয করার জন্য **আপন হাবীবের** পবিত্র মাযারে হাজির হওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন আর অবস্থা এমন, যে একবার এসে যাবে, সে কিয়ামত পর্যন্ত আর আসবে না। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ২/৪০১, হাদীস ৫৯৫৫)

প্রিয় হাবীবের সম্মানে পবিত্র কবরে এমন একজন ফিরিশতাকে নিযুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যে সমস্ত জগতের যে কোন ভাষা, যে কোন সময়, যে কোন ভাবে এবং যে কোন পরিমাণ দরূদ পাঠকারীর দরূদ এবং তার নামও পিতার নামসহ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করে থাকে। (আস সালাতু আলান নবী লিইবনে আবী আসিম, ৪২ পৃষ্ঠা, নম্বর ৫১)

দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারীদের বরযখী জীবনের প্রশান্তি আপন হাবীবের পরিচয় লাভের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, যে তাঁকে চিনতে পারবে সেই মুক্তি পাবে। (বুখারী, ১/৪৫০, হাদীস ১৩৩৮)

অনুগ্রহ ও মর্যাদার আজিমুশশান দৃশ্য হাশরের ময়দানেও দেখা যাবে। সর্বপ্রথম নূরানী কবর থেকে উঠা, আম্বিয়া ও সাহাবা এবং অন্যান্য ভালবাসা পোষণকারীদের সাথে হাশরের ময়দানের দিকে যাত্র এবং আরো অনেক ধরনের সম্মান দান করা হবে।

হাশরের ময়দানে নবীর মর্যাদার মহান ও চমৎকার দৃশ্য এটাও হবে যে, সকলেই **আল্লাহ পাকের** মহিমায় ভয়ে ও আতঙ্ক গ্রস্থ থাকবে,

মানুষ আম্বিয়ায়ে কিরামের দরবারে উপস্থিত হবে, যাতে তাঁরা **আল্লাহ পাকের** দরবারে সুপারিশ করেন, কিন্তু সকল নবীই অপরের কাছে পাঠাবে অবশেষে সকল মানুষ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আসবে এবং **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে **প্রিয় হাবীবের** মর্যাদা দেখবে। হাশরের ময়দানে যখন চারিদিকে নফসী নফসীর অবস্থা হবে ও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দরবারে সিজদায় মাথানত করবেন, তাও সম্মান ও মর্যাদার মহান এক দৃশ্য হবে যে, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ অর্থাৎ **আপনার** মাথা তুলুন, প্রার্থনা করুন প্রদান করা হবে আর বলুন! আপনার কথা শুনা হবে এবং শাফায়াত করুন, কবুল করা হবে। (বুখারী, ৩/১৬৫, হাদীস ৪৪৭৬)

হাশরের ময়দানে যখন পূর্ববর্তী জাতীরা তাদের নবী ও রাসূলদের অস্বীকার করবে তখন অস্বীকারকারীদের সামনে আম্বিয়ায়ে কিরামের সাক্ষী ও সত্যয়ন এবং পরিষ্কার ও স্পষ্ট করার জন্য **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষ্যই শেষ কথা হবে। (৫ম পারা, আন নিসা, আয়াত ৪১)

জান্নাতে সম্মান ও মর্যাদা

জান্নাতীরা জান্নাতেও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদা দেখবে, যার একটি সংক্ষিপ্ত ঝলক শুরুতেই বর্ণনাকৃত তৃতীয় হাদীসে পাকেও রয়েছে যে, এক হাজার খাদিম তাঁর খেদমতের জন্য উপস্থিত থাকবে, হাদীসে পাকে এই এক হাজার খাদিমের গুণাবলী "بَيْضٌ مَكْنُوْنٌ، أَوْ لُؤْلُؤٌ مَنْثُوْرٌ" শব্দাবলী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, এর ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: بَيْض হলো بيضة এর বহুবচন, এর দ্বারা উট পাখির ডিম উদ্দেশ্য। مكنون এর অর্থ হলো, যার উপর ধুলাবালি পড়েনি, নিজের মূল পরিছন্নতার উপরই বিদ্যমান। আরবে উট পাখির ডিমের রঙকে অনেক সুন্দর মনে করা হয় অতএব তাদেরকে বুঝানোর জন্য এরূপ ইরশাদ করা হয়েছে, কুরআনে করীমে হুরদের সৌন্দর্যকেও এই শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, তাছাড়া এই খাদিমদের ছড়ানো মুক্তাও বলা হয়েছে, কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐসকল খাদিম চারিদিকে ছড়িয়ে থাকবে অতএব তাদেরকে ছড়ানো মুক্তার মতো তুলনা করা খুবই উপযুক্ত। এই খাদিমরা হয়তো কিয়ামতেই **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশেপাশে থাকবে অথবা জান্নাতে, যদি জান্নাতে হয় তবে ঐ সকল গিলমানরা ব্যতীত হবে, যাদেরকে অন্যান্য জান্নাতীদের দান করা হবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩০)



ধারাবাহিক পর্ব: আলোকিত নক্ষত্র

হযরত সাওবান বিন বুজদুদ

আদনান আহমদ আত্তারী

একদা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহলে বাইতের জন্য দোয়া করলেন আর দোয়াতে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা ও হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহারা ও অন্যান্য আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ নাম উল্লেখ করেন।



একজন সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা সাওবান বিন বুজদুদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি তো আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোন সর্দারের দরজায় বা কোন ধনীর নিকট ভিক্ষা করতে না যাও। (মু'জামু আওসাত, ২/৮৫, হাদীস ২৬০৭) হযরত সায়্যিদুনা সাওবান বিন বুজদুদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উপনাম আব্দুল্লাহ আর মক্কা ও ইয়ামেনের মধ্যবর্তী সারাত নামক জায়গার অধিবাসী ছিলেন, তিনি বন্দী ছিলেন (আল ইস্তিয়াব, ১/২৯০) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করেছেন ও অধিকার দিয়ে ইরশাদ করেন: যদি তুমি চাও তবে তাদের নিকট চলে যাও, যাদের সাথে তোমার সম্পর্ক রয়েছে আর যদি তুমি চাও তবে আমার আহলে বাইতের সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও, তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য ও সম্পর্ককে প্রাধান্য দিলেন আর সারা জীবন সফর ও অবস্থানে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ছিলেন। (উসদুল গা'বা, ১/৩৬৭) **গুণাবলী:** হযরত সাওবানের উপাধি হলো মাওলা রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ এর খাদিম"। তিনি ঐ ৮জন সৌভাগ্যবান সাহাবীর অন্তর্ভূক্ত, যাঁদেরকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুয়াজ্জিন বলা হতো। একবার তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং ফজরের আযান দেয়ার অনুমতি চাইলেন। ইরশাদ করলেন: তুমি আযান দিওনা, যদিও সকাল হয়ে যায়। অতঃপর যখন তৃতীয়বার উপস্থিত হয়ে অনুমতি চাইলেন

তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে ফজরের সময় শুরু হওয়ার সঠিক সময় শিখালেন। (মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, ১/৩৬৫, হাদীস ১৮৯১। আত তারাতিবিল ইদারিয়্যা, ১/১২৫) **অভ্যাস ও রুটিন:** তিনি অল্পেতুষ্ট, নেককার ও হাসিখুশি স্বভাবের ছিলেন, তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তত্বাবধানে জীবন অতিবাহিত করেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২৩৬) নবী বংশের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার বিষয়াবলী দেখাশুনা করা তাঁরই উপর ন্যস্ত ছিলো (আল আনসাব লিল সামআনী, ১/৫১৬) তিনি বলতেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদায় হজ্জের সময় নিজের কুরবানির পশু জবাই করেন আর আমাকে ইরশাদ করেন: সাওবান! এই মাংস সংরক্ষণ করে রাখো, আমি তা সংরক্ষণ করে রাখলাম, আমি মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে যাওয়া পর্যন্ত **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই মাংস খাওয়াতে থাকি। (মুসলিম, ৮৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫১১০,৫১১২) একবার **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে ইরশাদ করলেন: হে সাওবান! ফাতেমার জন্য একটি আসাবের[১] গলার হাড় ও আ'জ (হাতির দাঁত) এর দু'টি কঙ্কন কিনে আনো।

জান্নাত লাভ করবে: একদা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার বাইয়াত কে করবে? তিনি আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা কি পূর্বে একবার আপনার বাইয়াত গ্রহণ করিনি, এখন কোন বিষয়ে বাইয়াত করবো? ইরশাদ করলেন: এই বিষয়ে যে, কারো কাছে কিছু চাইবে না। তিনি আরয করলেন: এতে কি পাবো? ইরশাদ করলেন: জান্নাত। একথা শুনে তিনি বাইয়াত গ্রহণ করে নিলেন। (মু'জামু কবীর, ৮/২০৬, হাদীস ৭৮৩২) এরপর তাঁর এই অবস্থা হয়ে গেলো যে, যদি ঘোড়ায় আরোহন অবস্থায় থাকতেন আর চাবুক নিচে পড়ে গেলে তবে কাউকে বলতেন না উঠিয়ে দিতে বরং নিজে ঘোড়া থেকে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন। (ইবনে মাজাহ, ২/৪০০, হাদীস ১৮৩৭) **দুনিয়ার কোন জিনিসটি যথেষ্ট হবে?** একবার তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার জন্য দুনিয়ার কোন জিনিসটি যথেষ্ট হবে? ইরশাদ করলেন: যা তোমার ক্ষুধাকে মিটিয়ে দেয় ও সতরকে ঢেকে দেয় আর যদি তোমার নিকট একটি ঘর থাকে যা তোমাকে ছায়া দেয় তবে এটাও ঠিক আর যদি বাহনের জন্য পশু থাকে তবে তাও খুবই ভালো। (আল মু'জামুল আওসাত, ৬/৪৪৫, হাদীস ৯৩৪৩) **রাসূলের আদব:** তিনি একবার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট দাঁড়ানো ছিলেন, এমন সময় এক ইহুদী এলো, সে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নাম ধরে ডাকলো তখন হযরত সাওবান তাকে জোরে ধাক্কা দিলেন, সে বলতে লাগলো: তুমি আমাকে ধাক্কা দিলে কেন? তিনি বললেন: তুমি **ইয়া রাসূলাল্লাহ** কেন বলোনি। (মুসলিম, ১৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭১৬) **রাসূলের প্রতি ভালবাসা:** তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুবই ভালবাসতেন ও রাসূলের স্মরণে ব্যাকুল থাকতেন, একদিন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর শরীরের রঙ ফেকাসে হয়ে গিয়েছিলো, শরীর দূর্বল লাগছিলো এবং দুঃখ ও বেদনা চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বেদনার

---

১. **টীকা: একটি সামুদ্রিক প্রাণীর হাঁড়, যা চাবুকের ন্যায় হয়ে থাকে, তা শুকিয়ে গলার হাড়ের পুতি বানানো হয়।** (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/১৭৮)

কারণ জিজ্ঞাসা করলে আরয করা হয়: আমার ব্যথাও না, অসুস্থও নই কিন্তু যখন আপনার সাক্ষাত হয়না তখন অস্থির হয়ে যাই আর প্রবল আতঙ্ক অনুভব করি, আর আপনার সাক্ষাত দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ করি, অতঃপর আখিরাতের স্মরণ আসে তখন এই আশঙ্কা ঘিরে নেয় যে, সেখানে আপনার সাক্ষাত করতে পারবো না, কেননা আমি জানি যে, আপনি আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথে উচ্চ ও মহান মর্যাদায় থাকবেন, আমি (**আল্লাহ**র রহমতে) যদিও জান্নাতে প্রবেশও করে নিই তবুও আপনার স্তরের নিচের স্তরে থাকবো আর যদি জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি না পাই তবে তো কখনোই আপনার যিয়ারত করতে পারবো না। এ ব্যাপারে কুরআনে করীমের আয়াত অবতীর্ণ হয়, **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আর যে **আল্লাহ** ও **রাসূলে**র আদেশ মান্য করে, তবে সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করবে, যাদের উপর **আল্লাহ পাক** অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ। এরা কতইনা উত্তম সঙ্গী। (তাফসীরে সাআলবী, ৫ম পারা, সূরা নিসা, ৬৯ নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৩৪১) **সিরিয়ায় আগমণ: নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফতের পর হযরত সাওবান رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সিরিয়ার শহর রামলা চলে এলেন, অতঃপর সেখান থেকে হামাস তাশরীফ নিয়ে এলেন (ইস্তিয়াব, ১/২৯১) এবং একজন সাধারণ মুজাহিদের মতো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন, (আনসাবু লিল সামআনী, ১/৫১৬) হামাসে তিনি একটি মুসাফির খানাও বানিয়েছিলেন। (সীয়রিস সালাফিস সালেহীন, ১৪০ পৃষ্ঠা) **উপদেশ:** তিনি মানুষকে উপদেশও দিতেন, যেমনটি একবার কাউকে বললেন: যদি তোমাদের নিকট ছাগল থাকে ও তাদের দুধ অবশিষ্ট রয়ে যায় তবে এই অবশিষ্ট দুধও বন্টন করে দাও। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২৩৮) তিনি বলতেন: নিজের তরবারীকে ধারালো করে রাখো, জিজ্ঞাসা করা হলো: এমনটি কেন করবে? তখন বললেন: তোমাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে ও তোমাদের অন্তরে অলসতা ও দূর্বলতা এসে গেছে, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: এটা কেন হলো? তখন বললেন: এই কারণে যে, তোমরা দুনিয়াকে ভালবাসছো আর মৃত্যু অপছন্দ করছো, সুসংবাদ হলো তাদের জন্য, যে নিজের জিহ্বাকে সংযত রেখেছে আর ঘরে বসে রয়েছে এবং নিজের ভূলের জন্য কান্না করেছে। (আয যুহুদ লি আবী দাউদ, ৩১৭ পৃষ্ঠা, নম্বর ৩৭৮) **সমবেদনা জ্ঞাপনে নেকীর দাওয়াত:** তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ অসুস্থ হলে হামাসের গভর্ণর দেখা করতে আসলো না, তিনি চিঠি লিখলেন: যদি হযরত সায়্যিদুনা মূসা ও ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام এর খাদেম তোমাদের নিকট থাকতো তবে তুমি অবশ্যই তার শুশ্রূষা করতে। গভর্ণর চিঠি পড়তেই আতঙ্কিত হয়ে গেলো এবং শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত হয়ে গেলো। যখন ফিরে যাচ্ছিলো তখন তিনি তাকে বসালেন এবং একটি হাদীসে মুবারাকা শুনান। (মুসনাদে আহমদ, ৮/৩৩১, হাদীস ২২৪৮১) **ওফাত:** তিনি ৪৫ বা ৫৪ হিজরী সনে ওফাত লাভ করেন (তাহযিবুল আসমা, ১/১৪৮) মুবারক কবর রামলা থেকে ৬ মাইল দূরে আমওয়াসে অবস্থিত বা দামেশকের কবরস্থান বাবে সগীরে অবস্থিত। (আনসাবু লিল সামআনী, ১/৫১৬) তাঁর থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণকারীদের মধ্যে আবু ইদ্রিস খাওলানি ও মা'দান বিন আবু তালহার মতো তাবেয়ী বুযুর্গের নাম পাওয়া যায়। (আল ইস্তিয়াব, ১/২৯১) তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকার সংখ্যা ১২৭টি যার মধ্যে ১০টি হাদীস সহীহ বুখারীর পৃষ্ঠাকে সজ্জিত করেছে। (তাহযিবুল আসমা, ১/১৪৮)



দু'টি নেয়ামতের গুরুত্ব দিন

নাসির জামাল আত্তারী মাদানী

{وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوها}

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যদি **আল্লাহ**র অনুগ্রহগুলো গণনা করো, তবে সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। (পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ৩৪)

প্রতিটি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা তো দূরের বিষয়, বান্দা তো সকল নেয়ামত গণনাও করতে পারবে না। এটাও **আল্লাহ পাকে**র অনুগ্রহ যে, সেই দয়ালু ও করুণাময় **প্রতিপালক** কৃতজ্ঞতা আদায়ে হওয়া অলসতায় না গ্রেফতার করেন, আর না **তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহের এই ধারাবাহিকতা বন্ধ করেন। এই হাদীসে পাকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দু'টি এমন

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য ও অবসর দু'টি এমন নেয়ামত, যার কারণে অধিকাংশ লোক ধোঁকায় পড়ে যায়। (বুখারী, ৪/২২২, হাদীস ৬৪১২)

আল্লাহ পাক মানুষকে অগণিত নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

নেয়ামতের উল্লেখ করেছেন, যা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অসংখ্য লোক ধোঁকায় পতিত হয়ে যায়, না এর মূল্য ও গুরুত্ব দেয় আর না তারা এই দু'টি নেয়ামতের মাধ্যমে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে সজ্জিত করে। সুস্বাস্থ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরীরের সুস্থতা এবং শক্তি ও সামর্থ্যবান হওয়া আর অবসর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, মানুষের দুনিয়ার চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া। উল্লেখিত হাদীসটি বুঝানোর জন্য ব্যাখ্যাকারকগণ যেই ব্যাখ্যা করেছেন তার সারমর্ম হলো:

(১) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, মানুষের নিকট যতক্ষণ সুস্থতা ও অবসর থাকে, সে এর গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু যখনই সুস্বাস্থ্য অসুস্থতায় আর অবসর ব্যস্ততায় পরিবর্তন হয়ে যায় তখন সেই কাজগুলো না করার জন্য লজ্জিত হয়, যেই কাজ এই দু'টি নেয়ামত বিদ্যমান থাকা অবস্থায় করেনি আর সে সময় লজ্জিত হওয়া তাকে কোন উপকৃত করে না। **(শরহুল মাসাবিহ লিইবনে মালিক, ৫/৩৮১, হাদীস ৩৯৯৭)**

উল্লেখিত হাদীসে সুস্বাস্থ্য ও অবসরকে পাথেয় এর সাথে তুলনা করা হয়েছে, কেননা এই দু'টি উপকারীতার কারণগুলোর অন্তর্ভূক্ত। যে সুস্বাস্থ্য ও অবসরকে **আল্লাহ পাকের** আহকাম পালনে ব্যবহার করে তবে তার উপকার হবে, যে শয়তানের কথা শুনে সুস্বাস্থ্য ও অবসরকে **আল্লাহর** অবাধ্যতায় ব্যবহার করে তবে তার পাথেয় নষ্ট হয়ে যায়।

(ফয়যুল কদীর, ৬/৩৭৫, ৯২৮০নং হাদীসের পাদটিকা)

এই দু'টি নেয়ামতের মূল্য ও গুরুত্ব **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরো একটি বাণী দ্বারাও স্পষ্ট হয়, যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গণিমত মনে করো, জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে, অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, সম্পদকে অভাবের পূর্বে, যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে এবং সুস্থ্যতাকে অসুস্থ্যতার পূর্বে।

(মুসান্নিফ আবী শায়বা, ৮/১২৭, হাদীস ১৮)

মানুষ এভাবে ধোঁকায় পড়ে: যে মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় আর নেকী করার সময়ও পায়, তবুও নিজের অলসতার কারণে নেকী করতে পারে না এবং "পরে করে নিবো, এখনো জীবন পড়ে আছে, আমার বয়সই বা কত, এই কাজ বৃদ্ধ বয়সের" এই রকম বাক্য বলে নিজের আশাকে দীর্ঘায়িত করে, সে অলসতা ও উদাসীনতার ফাঁদে ফেঁসে নিজের মূল্যবান সময় এবং সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যতার দিন গুলো নষ্ট করে দিচ্ছে।

কেউ এক হাকীমকে (জ্ঞানী) বললো, আমার সামনে এমন কোন জিনিসের গুণাবলী বর্ণনা করুন, যা ব্যবহারে আমি দিনের বেলায়ও ঘুমিয়ে থাকবো। হাকীম বললো: হে অমুক! তুমি কতইনা মূর্খ! তোমার বয়সের অর্ধেক অংশ তো প্রথমেই (রাতকে উদাসীনতায়) ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছো, অথচ ঘুম হলো মৃত্যুর অপর নাম আর এখন তুমি নিজের বয়সের চার ভাগের তিন ভাগও ঘুমিয়ে (অর্থাৎ মৃত্যু) কাটাতে চাও আর শুধু এক অংশ জীবন বানাতে চাও? তখন সেই বান্দা

জিজ্ঞাসা করলো: তা কিভাবে? সেই হাকীম বললো: যেমন; তোমার বয়স ৪০ বছর, তোমার জীবরের বয়স ২০ বছর হবে আর তুমি কিনা একে ১০ বছর বানাতে চাও (অর্থাৎ যখন দিনেও আরো ঘুমিয়ে থাকবে তখন আরো ১০ বছর কমে যাবে এবং তোমার নিকট আখিরাতের জন্য পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য শুধুমাত্র ১০ বছরই অবশিষ্ট থাকবে, অতএব অধিক ঘুমানোর আকাঙ্ক্ষা মন থেকে দূর করে দাও।) (কুতুল কুলব, ১/২০৬)

এই ঘটনায় বিশেষকরে ঐসকল মূর্খদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে, যাদের রাত দিনের অধিকাংশ সময় শুধু ঘুমানোতে বা অসুস্থদের মতো বিছানায় পড়ে থাকাতেই কেটে যায়, এমন লোকদের না নামাযের হুঁশ, থাকে আর না পরিবারের অধিকারের তোয়াক্কা। মনে রাখবেন! বিনা কারণে অধিক ঘুমানো এমন এক মন্দ অভ্যাস, যা সময়কে নষ্ট করার পাশাপাশি দুনিয়া ও আখিরাতের অপমান ও অপদস্থতার কারণ হয়ে থাকে, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হযরত সুলাইমান বিন দাউদ عَلَيْهِمَا السَّلَام কে তাঁর সম্মানিত আম্মাজান رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন: হে আমার সন্তান! রাতে বেশিক্ষণ ঘুমাইও না, কেননা রাতে অধিক ঘুমানো মানুষকে কিয়ামতের দিন ফকীর বানিয়ে দিবে।

(ইবনে মাজাহ, ২/১২৫, হাদীস ১৩৩২)

সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করুন: আমরা এই বিষয়টি ভালোভাবেই জানি, সাধারণত একজন অসুস্থ ব্যক্তি সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য ভালো কোন অবদান রাখতে পারেনা আর না সে আল্লাহ পাক ও বান্দার হকসমূহ ভালোভাবে আদায় করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য রাখে, আর একজন সুস্থ সবল ব্যক্তি সমাজকে শক্তি ও সাহস প্রদান করতে পারে আর মজলুমের সহায় হওয়া, অসহায়দের সাহায্য করা এবং দুঃখীদের বিপদ দূর করাতে সামনের সারিতে থাকতে পারে। অসুস্থতা মানুষের মধ্যে এক ধরনের বিরক্তি সৃষ্টি করে দেয়, আর সুস্বাস্থ্য মানুষকে সক্রিয় ও উদ্যম রাখে, অসুস্থতায় মানুষ মহান নেয়ামত খাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, আর সুস্থ সবল মানুষ এই জিনিস গুলোর স্বাদ গ্রহণ করে থাকে, একজন অসুস্থ লোক **আল্লাহ পাকের** ইবাদত সেইভাবে করতে পারে না, যেমনটি একজন সুস্থ মানুষ করে থাকে। আল্লাহ পাক আপনাদের সকলকে সুস্থতার নেয়ামত দান করেছেন, তাই একে গণিমত মনে করুন ও এর থেকে উপকারীতা গ্রহণ করে গুনাহ থেকে বিরত ও অপরকে বাঁচানোর অভ্যাস গড়ে নিন আর নেকী ও কল্যাণের কাজ করার অভ্যাস গড়ুন। নেকী করাতে দ্রুততাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন।

জগতের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ও জনাবে মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী থেকে এটাই বুঝে আসলো যে, সময় ও সুস্থ্যতা উভয়কেই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান মনে করা, উভয়েরই হিফযত করা এবং উভয়ের থেকে পরিপূর্ণভাবে দ্বীনি ও পরকালীন উপকার অর্জন করাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ।

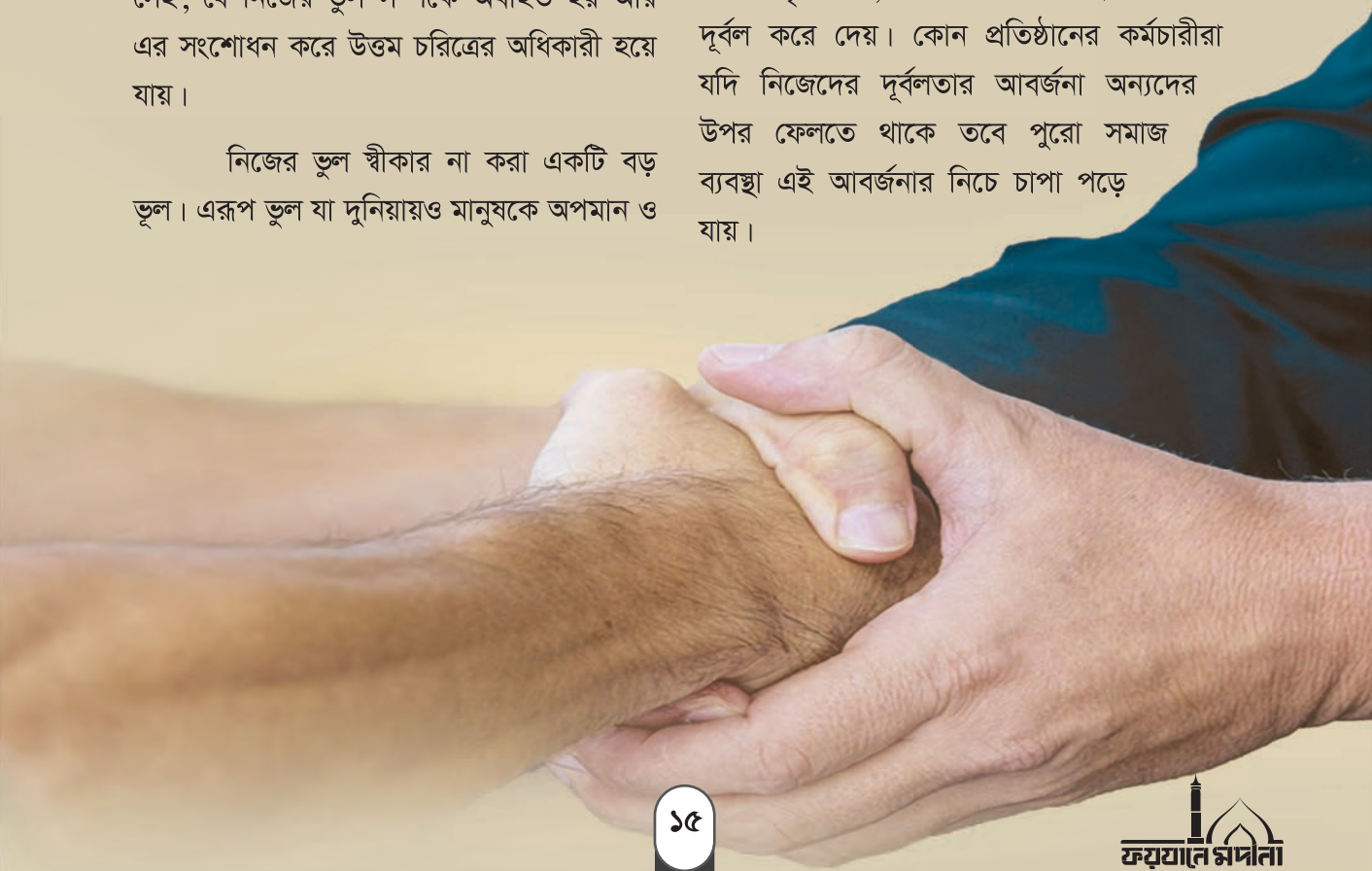
ভুল স্বীকার

ডাক্তার যি'রক আত্তারী

মানুষের দ্বারা ভুল হতেই পারে। এই বিষয়টি সকলেই স্বীকার করে কিন্তু খুবই কম লোক রয়েছে, যারা এই বিষয়টি স্বীকার করে যে, আমার ভুল হয়েছে। এমন কেন? অথচ সফলকাম সেই, যে নিজের ভুল সম্পর্কে অবহিত হয় আর এর সংশোধন করে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে যায়।

নিজের ভুল স্বীকার না করা একটি বড় ভূল। এরূপ ভুল যা দুনিয়ায়ও মানুষকে অপমান ও অপদস্থ করে দেয় আর আখিরাতে এর ক্ষতি আরো মারাত্মক হবে। আর বর্তমানে তো প্রায় লোক মুখে ও ইশারা ইঙ্গিতে বলে দেয় যে, আমার ভুল হতেই পারে না, অন্যরাই ভুল করেছে। এই "না মানা" এর ভয়াবহতা সকল প্রকার সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করছে।

স্বামী স্ত্রী যদি নিজের ভুল স্বীকার না করে তবে ঘরের শান্তি চলে যায়। সন্তান ও পিতামাতার মাঝে যদি অপরাধ স্বীকারের শূন্যতা থাকে তবে মমতা ও আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। ভাইবোন যদি একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে থাকে তবে এই পবিত্র সম্পর্কেও এমন ফাটল সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তী প্রজন্মের ভিত্তিকে দূর্বল করে দেয়। কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা যদি নিজেদের দূর্বলতার আবর্জনা অন্যদের উপর ফেলতে থাকে তবে পুরো সমাজ ব্যবস্থা এই আবর্জনার নিচে চাপা পড়ে যায়।



অতএব আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের উচিৎ, নিজের মধ্যে বিদ্যমান এই মন্দ স্বভাবের গভীরে যাওয়া আর এর শিখড়সহ উপড়ে ফেলা। ভুল স্বীকার না করার দু'টি বড় কারণ হলো:

(১) এই বিষয়ে উপলব্ধিও হয়না যে, আমি ভুল করেছি।

(২) আমিত্ব, জেদ ও গোঁড়ামীর কারণে জেনে শুনে ভুল স্বীকার না করা।

প্রথম অবস্থার প্রতিকার সহজ যদি কেউ করতে চায়। এর প্রতিকারের চারটি ধাপ রয়েছে:

(১) এতটুকু ইলমে দ্বীন শিখা, যা আমাদের জন্য ফরয। এতে মৌলিকভাবে ইবাদত, চালচলন ও নৈতিকতার শিক্ষা রয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশ এই শিক্ষা অর্জন করার অনন্য মাধ্যম।

(২) স্ব-দায়বদ্ধতার অভ্যাস গড়া ও নিজের ভুল নিজেই চেনার চেষ্টা করা। কেননা যেই ভুল মানুষ নিজেই স্বীকার করে নেয়, সেই ভুল সংশোধন করাও তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

(৩) যেই দোষ মানুষ অপরের মাঝে দেখে তা নিজের মাঝে তালাশ করা এবং যেই দোষ সে নিজের মাঝে পাবে, তার সংশোধনে লেগে যাওয়া।

(৪) কোন উত্তম, মুখলিস ও বুদ্ধিমান বন্ধুকে এই দায়িত্ব অর্পন করা যে, সে যেনো মাঝে মাঝে তার ভুল চিহ্নিত করতে থাকে। অপরের মুখে নিজের সংশোধনকে গ্রহণ করা অবশ্যই একটি কঠিন কাজ কিন্তু এর ফল খুবই উত্তম ও চমৎকার হয়।

যেনো এই চারটি অভ্যাস থাকলে তবে সে যেন একজন উত্তম মানুষ।

ভুল স্বীকার না করার দ্বিতীয় কারণ ছিলো, আমিত্ব, জেদ ও গোঁড়ামী। এর প্রতিকার দুনিয়াবী জ্ঞান ও কৌশলের মাধ্যমে প্রায় অসম্ভব, কেননা এই রোগের চিকিৎসার জন্য মানুষকে নিজের সত্তার পরিচয় জানতে হয়। যদিও সাইকো থেরাপীর মাধ্যমে অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীরা এর চিকিৎসা করার চেষ্টা করে থাকে কিন্তু এতে সফলতার হার খুবই কম।

এর বিপরীতে দ্বীন ইসলামের সুন্দর শিক্ষায় নিজের সত্তার পরিচয়ের যেই ভান্ডার বিদ্যমান, সেই সম্পর্কে কি আর বলবো। আসুন! এর একটি ঝলক দেখি।

ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** মানুষের অন্তরে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিয়েছেন, যে তাকে কল্যাণের দাওয়াত দেয়। এই ফিরিশতাকে মুলহিম আর তার দাওয়াতকে ইলহাম বলা হয়। এই ফিরিশতার বিপরীতে একজন শয়তানও মানুষের উপর আরোপ করা হয়েছে, যে মন্দের দিকে ডাকে। এই শয়তানকে ওয়াসওয়াস আর তার দাওয়াতকে ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) বলা হয়। ব্যস এই দুই ধরনের দাওয়াত প্রদানকারী বান্দার অন্তরে বিরাজমান রয়েছে আর তাকে সারা জীবন

দাওয়াত দিতে থাকে। বান্দা এই দাওয়াতকে নিজের অন্তরে শুনে আর অনুভব করে। এর পাশাপাশি **আল্লাহ পাক** মানুষের মূলে এমন স্বভাব রেখেছেন, যা আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার দিকে ধাবিত হয়। তা ভালো হোক বা মন্দ। এই বিষয়ের নাম হলো নফসের চাহিদা, যা মানুষকে বিপদে লিপ্ত করে দেয়। তো এই তিনটিই (অর্থাৎ ফিরিশতা, শয়তান ও চাহিদা) দাওয়াত প্রদানকারী। (মিনহাজুল আবেদীন, ৪৭ পৃষ্ঠা)

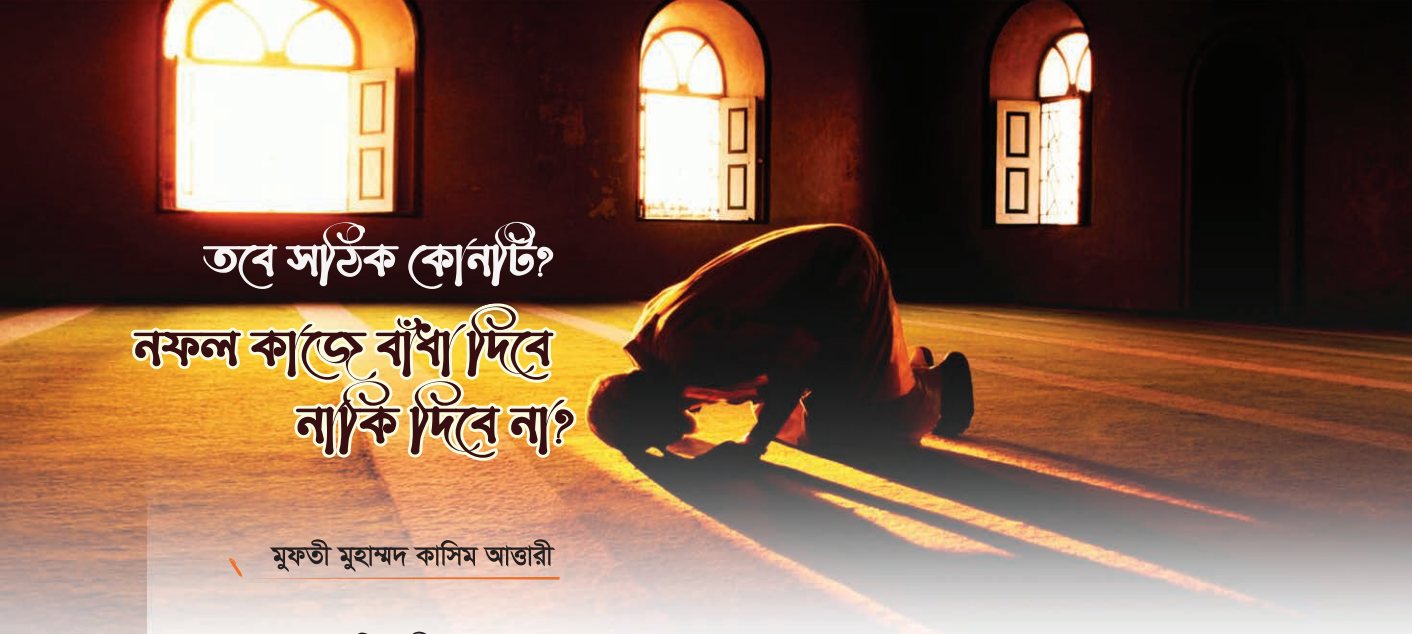
মাসিক ফয়যানে মদীনার পাঠকবৃন্দ! যেসকল মানুষ নেককার হয়ে থাকে তারা ফিরিশতার দিক থেকে আসা কল্যাণের দাওয়াত গ্রহণ করে আর এটাই কারণ যে, নেককার লোকেরা নিজের ভুল স্বীকার করাতে দেরী করেন না। আর এর বরকতে অন্যান্য মানুষের উপর উত্তম প্রভাব পড়ে এবং তাদের সম্পর্ক পরস্পর আনন্দময় হয়। এরূপ লোকদের ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হয়।

এর বিপরীতে ঐসকল লোক, যারা শয়তান ও চাহিদার অনুসরন করে তবে তাদের আমিত্ব, জেদ ও গোঁড়ামী আরো বৃদ্ধি পায় এবং তারা নিজের ভুল স্বীকার করাকে নিজের অপমান মনে করে। এরূপ লোক অন্যদের উৎসাহকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হককে পদদলিত করে দেয়। এই বিয়ষটি মনে রাখবেন, বান্দার হকের ব্যাপারটি খুবই মারাত্মক আর এতে অলসতা ও উদাসীনতার ক্ষতি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই ভোগ করতে হয়।

যদি আপনারাও আপনাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে সুখময় করতে চান তবে নিজের ভুল স্বীকার করা ও তাদের নিকট ক্ষমা চাওয়ার অনন্য স্বভাব বানিয়ে নিন, কেননা এতেই নিরাপত্তা নিহিত। এর জন্য নিজের সত্তাকে চেনা জরুরী। এব্যাপারে ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিশেষকরে দু'টি কিতাব (মিনহাজুল আবেদীন ও ইহইয়াউল উলুম) অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী।

কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখবেন, যদি আপনি সত্যিকার অর্থে নিজের সত্তাকে চিনতে চান তবে আমার পরামর্শ হলো যে, আপনি শায়খে কামিল আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ হয়ে যান ও তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ রূপে আমল করার চেষ্টা করুন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকত আপনি আপনার চোখেই দেখবেন। **আল্লাহ পাক** আমাদের সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم





তবে সঠিক কোনটি?
নফল কাজে বাঁধা দিবে নাকি দিবে না?

মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

নফলের গন্ডি (সীমা) অনেক প্রশস্ত, এর সম্পর্ক নফল নামায, রোযা, সদকা, হজ্জ, তিলাওয়াত, যিকির এবং স্বাভাবিক জীবনের আদব ও মুস্তাহাব সবকিছুর সাথে। নফলের ব্যাপারে শরয়ী হুকুম হলো যে, আদায় করলে তবে সাওয়ার পাবে আর ছেড়ে দিলে কোন গুনাহ নেই। অতএব যদি কোন ব্যক্তি এটিকে জরুরী ঘোষণা করে দেয় তবে সে ভুলের মধ্যে রয়েছে, যেমন; খাবার মাটিতে বসে খাওয়া সুন্নাত, যদি কেউ বলে, আবশ্যক, তবে সে ভুল বললো, অনুরূপ ভাবে নামাযের শুরুতে ও শেষে যেসব গাইরে মুয়াক্কাদা সুন্নাতও নফল নামায রয়েছে, যদি কেউ সে গুলোকে আবশ্যক ঘোষণা করে দেয় তবে সে একেবারেই ভুল বলছে, কিন্তু এর পাশাপাশি এই বিষয়টি মনে রাখুন যে, এই নফলী কাজের উৎসাহ অবশ্যই প্রদান করুন যে, বর্জন করাতে গুনাহ না হওয়া এক বিষয়, কিন্তু সেই আমল **আল্লাহ পাকের** দরবারে পছন্দনীয় হওয়া, তাছাড়া ক্ষমা ও নেকী বৃদ্ধির মাধ্যম হওয়া অন্য বিষয়। **নফল ও মুস্তাহাবের মধ্যে অনেক উপকারীতা রয়েছে।**

নফলের একটি উপকার হলো, তা নিজে তো আবশ্যক নয় কিন্তু কোন অত্যাবশ্যক বিষয় পর্যন্ত পৌঁছানোর কাজ করে থাকে, যেমন; আপনি কি এরূপ কোন মানুষ সম্পর্কে শুনেছেন বা দেখেছেন কিংবা পড়েছেন, যে বিশ রাকাত তারাবীর নামায নিয়মিত পড়ে আর ইশার নামায পড়ে না? বা কোন ব্যক্তি যে ফজরের সুন্নাত পড়ে ঘরে চলে যায় আর ফরয পড়ে না, নিঃসন্দেহে দেখেননি। এর উদ্দেশ্য হলো, যেই ব্যক্তি এরূপ নেক কাজ করছে, যা জরুরী নয় তবে সে এই ধরনের জরুরী কাজ তো সে আরো বেশি করবে। এমন তো হয়না যে, এক লোক তাহাজ্জুদ তো পড়ে কিন্তু ফজর পড়ে না, অনুরূপভাবে এমনও হতে পারে না যে, এক লোক রজব ও শা'বনের সকল নফল রোযা রাখলো কিন্তু রমযানের ফরয রোযা ছেড়ে দিলো। আসলে নফল, ফরয পর্যন্ত নিয়ে যায়।

নফলের দ্বিতীয় উপকারীতা হলো, কিয়ামতের দিন মানুষের ফরযে যেই স্বল্পতা হবে

তা নফলের মাধ্যমে পূরণ করা হবে, যেমনটি তিরমিযী শরীফে রয়েছে: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষের কাছ থেকে তার আমলের ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন হবে নামাযের ব্যাপারে, ব্যস! যদি নামায ঠিক থাকে তবে সে সফল হলো, আর যদি নামায (এর ব্যাপারটি) খারাপ হয় তবে সে বিফল হলো, আর যদি তার ফরযে অলসতা পাওয়া যায় তবে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: দেখো এই বান্দার নফল আছে কি? অতঃপর তা দ্বারা ফরযের স্বল্পতা পূরণ করে দেয়া হবে, অতঃপর অবশিষ্ট আমলেও এরূপ করা হবে। (তিরমিযী, ১/৪২১,হাদীস, ৪১৩)

নফল ও মুস্তাহাব কাজের তৃতীয় উপকারীতা খুবই হৃদয়কাড়া ও অসাধারণ আর তা হলো, কতিপয় কাজ যদিও শুধু মুস্তাহাব বরং উত্তম মুস্তাহাবের অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু তা গুনাহের সামনে এমন ঢাল হয়ে যায় যে, সম্ভবত অনেক জরুরী নেকীও সেরূপ গুনাহ থেকে বাঁধা প্রদানকারী হয়না, যেমন; যদি কারো সুন্নাত অনুযায়ী অবয়ব ও পোশাক হয় যে, চেহারায় দাঁড়ি, মাথায় পাগড়ী এবং নেককারদের অনুকরণে মাথায় চাদর থাকে, তবে কি এরূপ আকৃতি ও পোশাকের ব্যক্তি সিনেমা (Cinema) হলে যাবে? পণ্য বিক্রি করতে ধোঁকাবাজি করবে? অশ্লীল কথাবার্তা বলবে? কাউকে গালি দিবে? বাজারে লোফারদের মতো আচরণ করবে? নামুহরিম মহিলাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখবে? সাধারণত কখনোই করবে না, কেননা যদি কেউ এরূপ করে তবে লোকেরাই বলে উঠবে, আরে ভাই! এটা কি! মৌলানা হয়ে বা দাঁড়ি রেখে বা পাগড়ী পরিধান করে এরূপ কাজ করছো। এ থেকে স্পষ্ট হলো, এই মুস্তাহাব গুনাহের সামনে ঢাল হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে ভাবুন যে, যদি কোন ব্যক্তি পাগড়ী বেঁধে নামাযের সময় আরামে বসে গল্প গুজব করে থাকে তবে যে অন্য লোকেরা সেখানে বসে আছে, যারা নামায পড়ে না তারাও পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তিকে বলে দিবে যে, মাওলানা সাহেব আযান হয়ে গেছে, জামাআত হচ্ছে।

সারমর্ম হলো, মূল হুকুম তো এটাই যে, আমরা যেনো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি, হারাম থেকে বেঁচে থাকি, ফরয আদায়কারী হই, কিন্তু এই নফল কাজ আমাদেরকে ঐ ফরয পর্যন্ত নিয়ে যেতে সহায়ক হিসেবে প্রমাণিত হয়। জানা গেলো, অসংখ্য মুস্তাহাব ও নফলের এই উপকারীতা হয় যে, তার ফরয ও ওয়াজিব আদায় এবং হারাম বিষয় থেকে বাঁচতে অনেক বেশি সহায়ক প্রমাণিত হয়ে থাকে।

নফল ও মুস্তাহাবের সাথে সম্পর্কের পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এটাও যে, ইবাদতের প্রতিটি পদ্ধতি **আল্লাহ** পাকের সাথে সম্পর্কের মাধ্যম। শরয়ী হুকুম হলো, ফরযকে আবশ্যকভাবে প্রাধান্য দিবে আর ফরয সম্পন্ন করার পর নফলের দিকে আসবে, অন্যথায় নফলও কবুল না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে! কিন্তু এর পাশাপাশি সর্বাবস্থায় ইবাদত ও আনুগত্যে **আল্লাহ পাকের** সাথে সম্পর্কের দিকটি অবশ্যই বিদ্যমান থাকে।

ফরয ও ওয়াজিবের তো কিছু পালন করা আর কিছু ছেড়ে দেয়ার সুযোগ নেই, তা তো সব আদায় করতে হবে কিন্তু নফলের পর্যায়টি অনেক ব্যাপক এবং প্রত্যেক নফলী কাজ **আল্লাহ পাক** পর্যন্ত পৌঁছানোতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সূফীয়ায়ে কিরাম বলেন: **আল্লাহ পাক** পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ সৃষ্টির নিঃশ্বাসের সংখ্যার সমান। তাই নফলের ব্যাপারে যা ইচ্ছা পালন করে নিন, এতে মানুষের আগ্রহ ভিন্ন হয়ে থাকে, কেউ নামাযের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে থাকে আর কেউ রোযার প্রতি আগ্রহ বেশি পোষণ করে, কেউ হজ্জ ও ওমরা বেশি উপভোগ করে থাকে আর কারো নিকট **আল্লাহ**র যিকিরে বেশি প্রশান্তি অর্জিত হয়, কারো তিলাওয়াতের প্রতি আগ্রহ বেশি হয়ে থাকে এবং কারো দরূদে পাকের প্রতি ভালবাসা, কারো গরীবকে খাবার খাওয়ানোতে বেশি ভালো লাগে আর কারো বিপদগস্থের বিপদ দূর করাতে খুশি অনুভূত হয়, কেউ পিতামাতার খেদমতে সদা প্রস্তুত থাকে আর কেউ মানুষের সাথে কথাবার্তা সদাচরণের সহিত করে থাকে, মুচকি হেসে সাক্ষাত করে আর অপরের চেহারায় মুচকি হাসি নিয়ে আসে। এরূপ হাজারো পথ রয়েছে, যাতে পরিচালিত হয়ে বান্দা **আল্লাহ** পাকের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করতে পারে আর কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। হাদীসে কুদসীতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমার বান্দা আমার নৈকট্য সবচেয়ে বেশি ফরযের মাধ্যমে অর্জন করে আর নফলের মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এমনকি আমি তাকে প্রিয় বানিয়ে নিই।

(বুখারী, ৪/২৪৮, হাদীস ৬৫০২)

তাই নফল ও মুস্তাহাবের প্রতি ভালবাসা পোষণ করুন, তা পালন করুন, তা নিজের জীবনে অন্তর্ভূক্ত করুন এবং ঐসকল মানুষ থেকে দূরে থাকুন আর তাদের কথা শুনবেন না, যারা ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করার পরিবর্তে তা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে রাতদিন কথা বলতে থাকে।



নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ

উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া

মানুষ যেই নেয়ামত, আরাম, আয়েশ ও প্রশান্তি লাভ করে তাতে মানুষের কোন কৃতিত্ব নেই বরং এসবই **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহেই হয়ে থাকে, যদি আমরা এই নেয়ামতের জন্য **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা আদায় করতে থাকি তবে এই নেয়ামত শুধু নিরাপদ ও অব্যাহত থাকবে না বরং **আল্লাহ পাক তাঁর** পবিত্র কুরআনের ওয়াদা অনুযায়ী এতে বৃদ্ধিও করে দিবেন, কিন্তু এখানে এই বিষয়টিও মনে গেঁথে রাখার প্রয়োজন রয়েছে যে, এমন অনেক কারণও রয়েছে, যা মানুষকে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দেয়, এই নিবন্ধে এমনই কয়েকটি কারণের ব্যাপারে লিখা হয়েছে, অবলোকন করুন!

(১) নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটি কারণ হলো অকৃতজ্ঞতা! যদি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা না হয় তবে তার প্রতি **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হন এবং **তাঁর** অকৃতজ্ঞতা খুবই অপছন্দনীয়, **আল্লাহ পাক** কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন: (وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ۠) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো, আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৫২) নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞতা আদায় করাতে নেয়ামত বৃদ্ধি পায় এবং অকৃতজ্ঞতায় কমে যায়, এই কারণে আমাদের উচিৎ যে, সর্বাবস্থায় অর্থাৎ পোশাক, ঘর, খাওয়া দাওয়া, চাল চলনের ব্যাপারাদী এবং স্বামীর ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা আদায় করতে থাকা, যাতে **আল্লাহ পাক** আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হন ও আমরা যেনো নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে না যাই। **(২) নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটি কারণ হলো অত্যাচার!** অত্যাচারী মানুষকে **আল্লাহ পাক** একেবারেই পছন্দ করেন আর অত্যাচারের ভয়াবহতায়ও বান্দা অসংখ্য বিপদে গ্রেফতার হয়ে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, অত্যাচারের কারণে বান্দা ঈমানের মতো মহান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারে, যেমনটি হযরত আবু বকর ওয়াররাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: বান্দার উপর অত্যাচার করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈমান হরণের কারণ হয়ে যায়। (তাম্বিহুল গাফেলিন, ২০৪ পৃষ্ঠা) **(৩) নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আরো একটি কারণে হলো**

অহঙ্কার, গর্ব ও দাম্ভিকতা! গর্ব ও অহঙ্কার ও নেয়ামতের পতনের একটি কারণ, হযতর সালমা বিন আকওয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে এক ব্যক্তি বাম হাতে খেতে লাগলো, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ডান হাতে খাও।" সে অহঙ্কার করে বললো: "আমি ডান হাতে খেতে পারি না।" (যেহেতু এই অহঙ্কারী দাম্ভিকতার কারণে এরূপ বলেছিলো তাই) **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ** করুক যেনো এমনই হয়!" অতএব এরপর এমনই হলো, সে নিজের ডান হাত উঠিয়ে আসলেই তার মুখ পর্যন্ত নিতো পারছিলো না। (মুসলিম, ৮৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫২৬৮) **(৪) নেয়ামত থেকে বঞ্চনার আরো একটি কারণ হলো সাধারণত গুনাহ!** নিয়মিত গুনাহে লিপ্ত থাকা, **আল্লাহ পাকে** একেবারেই ভয় না করা, তাওবার দিকে না আসা এবং **তাঁর** অবাধ্যতা করতে থাকাও নেয়ামতের পতন এবং **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টিতার কারণ। আসমান থেকে অবতীর্ণ করা খাবারের ব্যাপারে যখন বনী ইসরাঈলরা অবাধ্যতা করলো তখন এমন দুর্ভাগ্য ছড়িয়ে পড়লো যে, যা কিছু লোকেরা পরবর্তী দিনের জন্য জমা করেছিলো, তা সবই নষ্ট হয়ে গেলো এবং ভবিষ্যতের জন্য তা অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ হয়ে গেলো, তাই **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি বনী ইসরাঈলরা না হতো, তবে না খাবার নষ্ট হতো আর না মাংস পঁচে যেতো। (মুসলিম, ৫৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬৫১) খাবার নষ্ট হওয়া এবং মাংস পঁচে যাওয়া সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছে। জানা গেলো, অবাধ্যতার অমঙ্গলেও নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সকল কারণ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم



স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পার্থক্য

মাওলানা আসাদ আত্তারী মাদানী

স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বপ্নদ্রষ্টার মেজাজ, স্থান, পরিস্থিতি ও অবস্থানের ভিত্তিতে ভিন্ন হয়ে থাকে, যেমন; একই স্বপ্ন একজন সাধারণ মানুষ দেখলো আর এই স্বপ্নটি কোন বাদশাহ দেখলো তবে উভয়ের ব্যাখ্যা ভিন্ন হতে পারে, কেননা আনার দেখার ব্যাখ্যা একজন সাধারণ মানুষের ব্যাপারে এক, আর বাদশাহ দেখলে তবে যুদ্ধ ও এতে সফলতার নিদর্শন হতে পারে। অনুরূপভাবে এলাকার ভিন্নতাও ব্যাখ্যায় পার্থক্য হতে পারে, যেমন; কুকুর দেখার ব্যাখ্যা শহরের অধিবাসীদের জন্য গ্রাম্যদের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মানুষের চালচলন, কথাবার্তা, সংস্কৃতি, ঋতু এসব বিষয় ব্যাখ্যার উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাই এই সকল বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনাকারীর জন্য জরুরী।

অনুরূপভাবে সময়ের পার্থক্যেও ব্যাখ্যা ভিন্ন হয়ে থাকে, একই স্বপ্ন দিনে দেখলে এর ব্যাখ্যা এরূপ, রাতে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিন্ন হতে পারে, অনেক কিতাবে রীতিমতো এই বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পার্থক্যের একটি কারণ লিঙ্গের পার্থক্যও হয়ে থাকে, এই বিষয় পুরুষের জন্য ভালো আর মহিলার জন্য খারাপ, অনুরূপভাবে এর বিপরীতও হতে পারে, যেমন; স্বপ্নে পুরুষের জন্য কাঁধের নিচে পর্যন্ত লম্বা চুল মহিলাদের লম্বা চুলের চেয়ে ভিন্ন হবে, এভাবে অসংখ্য বিষয়ে পার্থক্য পাওয়া যায়।

স্বপ্নের ব্যাখ্যায় নেককার ও গুনাহগারের পার্থক্যও হয়ে থাকে, একই স্বপ্ন নেককার লোকের জন্য ভালো আর ফাসিকের জন্য খারাপ হতে পারে, যেমনটি একবার ইমাম ইবনে সীরিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো আর একটি স্বপ্ন বর্ণনা করলো, আমি স্বপ্নে আযান দিচ্ছিলাম। বললেন: হজ্জে যাবে। আরেক ব্যক্তিও এই স্বপ্ন বর্ণনা করলে তিনি বললেন: তুমি কোন অপরাধে গ্রেফতার হবে আর শাস্তি পাবে। লোকেরা বিস্ময় প্রকাশ করলো যে, স্বপ্ন তো একই কিন্তু উভয়ের জন্য ব্যাখ্যা পৃথক কেন? তখন তিনি বললেন: প্রথম ব্যক্তিকে তার পোশাক -পরিচ্ছেদ ও অবস্থা দেখে নেককার মনে হচ্ছিলো আর দ্বিতীয়জন এরূপ ছিলো না অতএব উভয়ের ব্যাখ্যার জন্য আমি পৃথক পৃথক আয়াত থেকে Reference নিলাম আর ব্যাখ্যা বর্ণনা করলাম, এই বর্ণনা থেকে আমরা এটাও জানতে পারলাম যে, নেকী মানুষের ব্যক্তিত্বের জন্য কিরূপ উপকারী আর গুনাহ কিরূপ ধ্বংসাত্মক হতে পারে। (তা'বিরুর রাওয়াইয়া, ১৬৮ পৃষ্ঠা)

আপনাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা

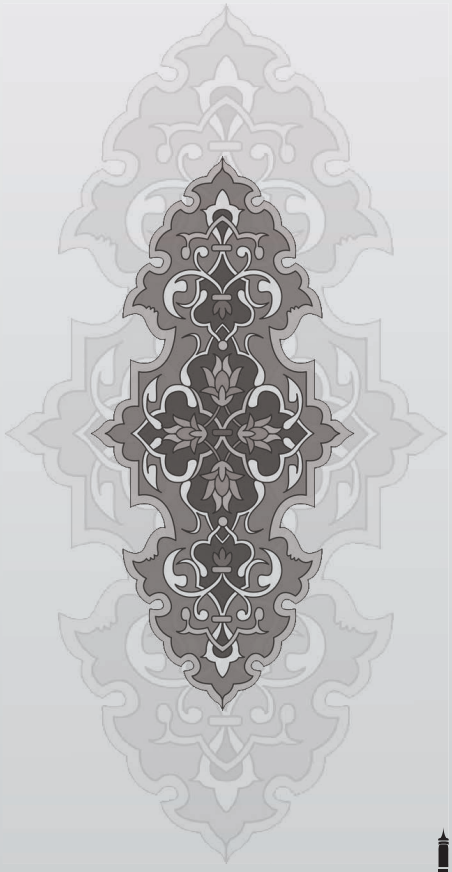
স্বপ্নঃ আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, আমি সমুদ্রের পাশে বসে আছি আর পানির ঢেউ দেখছিলাম, এমন সময় একজন বৃদ্ধ লোক আমার নিকট এলো আর তার হাতে নাস্তার বাক্স ছিলো, আমার নিকট বসে গেলো ও খাবারের নাস্তার বাক্স খুললো আর বললো এসো বৎস আমার সাথে খাবার খাও, আমি তার খাবারের দিকে এই ভেবে তাকালাম যে, খাবারে জানিনা কি হবে, যখন খাবার দেখলাম তখন মনে হলো তা নিহারী, অতঃপর আমি খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম, তখন আমাকে বলা হলোঃ থামো, অতঃপর এতে অনেক ঘি মিশিয়ে দিলেন যে, নিহারী কম আর ঘি বেশি দেখা যাচ্ছিলো, দেখতোও অনেক অদ্ভুত লাগছিলো, অতঃপর আমাকে বললো, এবার আপনি খান, অতঃপর আমি তার সাথে পেট ভরে নিহারী আর ঘি খেলাম। দয়াকরে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করে দিন।

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

ব্যাখ্যাঃ সমুদ্র দেখা কোন বড় মর্যাদাবান ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক হওয়ার দলীল, হয়তো আপনি এমন কোন কাজে ব্যস্ত হবেন, যাতে অনেক লোকের ব্যাপারাদির সম্মুখীন হবেন, তবে বৃদ্ধ লোকের এসে মমতা প্রদর্শন করা এই বিষয়ের দলীল যে, আপনি আপনার কাজে সফলতা অর্জন করবেন اِنْ شَآءَ اللّٰه, অতএব যদি আপনি কোন বড় বা অসাধারণ কাজে লিপ্ত হতে চান তবে একে ভালভাবে করুন এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন।

স্বপ্নঃ আমি স্বপ্নে বেজি দেখলাম, তা কখনো আমার কাছে আসে, মুখ খুলে, আমার ভয় হয় যে, আমাকে কামড় দিবে না তো, কিন্তু **আল্লাহ**র কৃতজ্ঞতা যে, তা কামড় দেয়নি, তবে অনেক ভয় পেয়েছি। (ইসলামী বোন)

ব্যাখ্যাঃ স্বপ্নে বেজি দেখা চুরির নিদর্শন। অতএব স্বপ্নদ্রষ্টার উচিৎ, সে যেনো তার মালামালের নিরাপত্তায় অলসতা না করে, অনেক সময় এরূপ স্বপ্ন দেখার উদ্দেশ্য মানুষকে সতর্ক করা হয়ে থাকে, যা কিনা মুমিন বান্দার জন্য নেয়ামত।



পিতামাতার প্রতি

চারাগাছের যত্ন নিন

আসিফ জাহানযীব

বাগানে লাগানো ফল, ছায়াযুক্ত বৃক্ষ, রঙ বেরঙের ও বিভিন্ন সুবাসিত ফুল খুবই সুন্দর ও মনোরম দেখা যায়, যেখানে একজন মানুষ এর সৌন্দর্য্য দ্বারা অবিভূত হয়, তেমনি ভাবে এ থেকে বিভিন্ন উপকারীতা অর্জন করে। কিন্তু এই গাছ ও ফুলের চারার এই সৌন্দর্য্যের পেছনে অনেক পরিশ্রম লুকিয়ে আছে। মালি বীজকে মাটিতে বপন করে, তাতে পানি দেয়, উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা করে, ভালো ফলনের জন্য সার দেয়, কচি চারা থেকে শক্তিশালী কান্ডের গাছ হওয়া পর্যন্ত মালি এই চারাগুলোকে প্রতিটি জিনিস থেকে রক্ষা করে, ঔষধ ছিটায়, সোজা রাখার জন্য কোন কাঠ ইত্যাদির সাথে বেঁধে দেয়, বাগিচায় বিভিন্ন চারা এমনিতেই জন্মায়, মালি আগাছা কেটে নিজের চারাকে রক্ষা করে, এই সময় মৌসুমি প্রভাব থেকে এই চারাকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এত পরিশ্রমের পরই কোনটি সুগন্ধিময় ফুল হয়, কোনটি ফলদার বৃক্ষ হয়, আবার কোনটি ছায়াযুক্ত বৃক্ষ হয়। এই গাছগুলোর প্রতিটি অংশ উপকারী হয়ে যায়।

সম্মানিত পিতামাতা! যেমনিভাবে একটি বীজ থেকে গাছ হওয়া পর্যন্ত এর লাগাতার দেখাশুনা করতে হয়, তেমনিভাবে একজন সফল ব্যক্তি হওয়া পর্যন্ত সন্তানের লাগাতার নজরদারী ও লালনপালন করতে হয়। শুধু সন্তানকে মাদরাসায় বা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়াতে এই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। নিম্নে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে, যার যত্ন নেয়া জরুরী:

(১) যেমনিভাবে ফসলকে উপযুক্ত সার ও পানি দেয়া হয় তেমনি ভাবে সন্তানের মানসিকতাকে দৃঢ় ও বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষা প্রদান করতে হবে যাতে আধুনিক যুগের ফিতনা তার আকীদাকে ক্ষতি করতে না পারে।

(২) যেমনিভাবে চারাকে মারা যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য পানি ও আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়, তেমনিভাবে সন্তানকে উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আলো দ্বারাও আলোকিত করুন, যাতে তার মানসিক সক্ষমতা সতেজ থাকে, তার ভালভাবে বেড়ে উঠে হয় এবং সে সমাজের সফল ব্যক্তি হয়ে মানবতার উন্নতিতে নিজের কৃতিত্ব রাখতে পারে।

(৩) যেমনিভাবে ফসল বা চারাকে কীট পতঙ্গ ও ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে বাঁচানের চেষ্টা করা হয় যাতে ফসল নিরাপদ থাকে, তেমনিভাবে সন্তানের সহচর্যের প্রতিও সজাগ থাকুন ও মন্দ সহচর্য থেকে তাকে রক্ষা করুন, যাতে তার চরিত্র ও আচরণের অবনতি না হয়।

(৪) যেকোন বৃক্ষ বা ফসল কোন উদ্দেশ্য ও উপকারের জন্য কাটা হয়ে থাকে, তেমনিভাবে সন্তানকেও শুরু থেকেই উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন যাপনের মানসিকতা প্রদান করুন, যাতে সে নিজের জীবনকে সাজাতে পারে, উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করার মধ্যে কোন উপকারীতা নেই।

সম্মানিত পিতামাতা! যদি শুরু থেকেই সন্তানের খাবার, শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ ইত্যাদির দেখাশুনা করা হয় তবে নিঃসন্দেহে সেই সন্তান বড় হয়ে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে ও সমাজের সফল ব্যক্তি হিসেবে জীবন অতিবাহিত করবে, যার আচরণে সমাজের অন্যান্য লোকেরাও উপকারীতা অর্জন করবে।

মাদানী ক্লিনিক

শিশুদের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা

(Amblyopia in children)

ডাক্তার উম্মে সারিব আত্তারীয়া

শিশুদের দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা

শিশুদের দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতাকে অ্যাম্বলিওপিয়া (Amblyopia) বলা হয়। যখন মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিশক্তিকে চোখের দিকে প্রতিফলিত করে না তখন অ্যাম্বলিওপিয়া হয়ে যায়। এটা সাধারণত একটি চোখে হয়ে থাকে তবে উভয় চোখেও হতে পারে। অ্যাম্বলিওপিয়াকে অলস চোখ অর্থাৎ Lazy eyeও বলা হয়ে থাকে।

মস্তিষ্ক ও চোখ দৃষ্টি শক্তি সৃষ্টি করার জন্য একত্রে কাজ করে। অতএব যেকোন এক চোখের দৃষ্টি দূর্বল হওয়ার অর্থ হলো, মস্তিষ্ক ও ঐ চোখ সম্পূর্ণ রূপে একত্রে কাজ করছে না, এরূপ পরিস্থিতিতে মনোযোগ অপর চোখের দিকে বেশি থাকে আর এই ভালো চোখ (Good eye) দ্বারা বেশি ভালো দেখা যায়, কেননা মস্তিষ্কের ফোকাস (Focus) এর দিকেই হয়ে থাকে। এভাবে অলস চোখ আরো অলস হতে থাকে আর তা দ্বারা ঝাপসা দেখা দিতে থাকে।

বিভিন্ন কারণ (Causes)

দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার বিভিন্ন কারণ হতে পারে, এরমধ্যে ১০টি নিম্নে দেয়া হলো:

(১) চোখ টেরা হওয়া (Strabismus)। (২) চোখের ঝাপসা দৃষ্টি অর্থাৎ ছানি (Cataract)।(৩) চোখের পাতা ঝুলে পড়া (ptosis)। (৪) সময়ের পূর্বে জন্ম (Premature birth)।(৫) টেরা বা দৃষ্টিশক্তি দূর্বলতা বংশগত হওয়া।(৬) বিষম দৃষ্টি সম্পন্ন (Astigmatism)। (৭) এমন কোন রোগ যার প্রভাব চোখে পড়ছে। (৮) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (Refractive error)।

অধিক বিপদ সঙ্কুল বয়স

নয় বছরের কম বয়সী শিশুদের বেশী ঝুকি হয়ে থাকে, শিশু যত ছোট হবে, বিপদ ততই বেশি হবে, কেননা এই বয়সের শিশুদের দৃষ্টিশক্তি তৈরী হয়ে থাকে, অতএব শিশুকালে যতদ্রুত অ্যাম্বলিওপিয়া রোগ নির্ণয় (Diagnosis) হয়ে যাবে, ভাল হওয়ার সম্ভাবনা (Improvement chances) ততই বৃদ্ধি পায়।



কঠিন তখনই হয় যখন শিশুদের চোখে প্রকাশ্য কোন সমস্যা দেখা না দেয় এবং সে সম্পূর্ণরূপে ভাল (well-aligned eyes), কেননা সাধারণত এরূপ শিশুদের দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা বা নষ্ট হওয়ার প্রতি মনোযোগই যায়না অতএব ডাক্তারের নিকট নিয়েও যাওয়া হয় না।

অ্যাম্বলিওপিয়ার চিকিৎসা (Treatment of Amblyopia)

চোখের ব্যাপারটি খুবই সংবেদনশীল হয়ে থাকে ও শিশুদের মাঝে অ্যাম্বলিওপিয়ার প্রকৃতিও একে অপরের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। অতএব এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকটই যাওয়া উচিৎ যাতে তিনি শিশুর বয়স ও অ্যাম্বলিওপিয়ার কারণসমূহের প্রতি চিন্তাভাবনা করে উত্তম চিকিৎসা করতে পারে। তবে এর দু'টি চিকিৎসা পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হলো:

(১) দৃষ্টিশক্তির জন্য চশমা (Eyesight glasses): দৃষ্টিশক্তি প্রখর করার জন্য চশমার প্রয়োজন হতে পারে। চশমা দ্বারা উভয় চোখের ফোকাস ঠিক হয়ে যায় ও একই সাথে কাজ করতে সাহায্য করে। অতএব যেই শিশুর জন্য ডাক্তার দৃষ্টিশক্তির চশমা সাজেষ্ট করবে সেই শিশুর জাগ্রত অবস্থায় সর্বদা চশমা পরিধান করা জরুরী।

(২) প্যাচিং (Patching): এটি এমন এক চিকিৎসা পদ্ধতি, যাতে উন্নতি (Improvement) করার সম্ভাবনা বেশি হয়ে থাকে, বিশেষকরে যদি শিশুর অল্প বয়সেই চিকিৎসা শুরু হয়ে যায়।

এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে ভাল চোখের Vision (অর্থাৎ দৃষ্টি) কে ব্লাক করে দেয়া হয় যাতে দূর্বল চোখ বেশি কাজ করে এবং এর Visionও শক্তিশালী হয়।

আই প্যাচ (Eye patch) এক ধরনের পর্দা, যা শিশুদের ভাল দৃষ্টিশক্তি সমৃদ্ধ চোখে (Good eye) লাগিয়ে একে ঢেকে দেয়া হয়, এর সময়সীমা বয়সের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, যদি শিশু ৪ বছরের হয় তবে ৪ ঘন্টা, ৫ বছরের হলে তবে দিনে ৫ ঘন্টা এবং অনূরূপভাবে শিশু যত বড় হয়ে যাবে, প্যাচিংয়ের সময়সীমাও ততই বাড়তে থাকে, প্যাচিংয়ের সময় শিশুকে চোখের ব্যবহারের কাজ করান, যেমন; লেখা, পড়া ইত্যাদি।

এই চিকিৎসা পদ্ধতির সময় শিশুকে মাঝে মাঝে ডাক্তারের নিকট চেকআপের জন্য নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, যাতে ডাক্তার সাহেব বলতে পারেন যে, কতদিন পর্যন্ত শিশুর প্যাচিং জরুরী, কেননা দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হওয়া অবস্থায় প্যাচিংয়ের সময়সীমা কমিয়ে ধীরে ধীরে বন্ধ করা হয়।

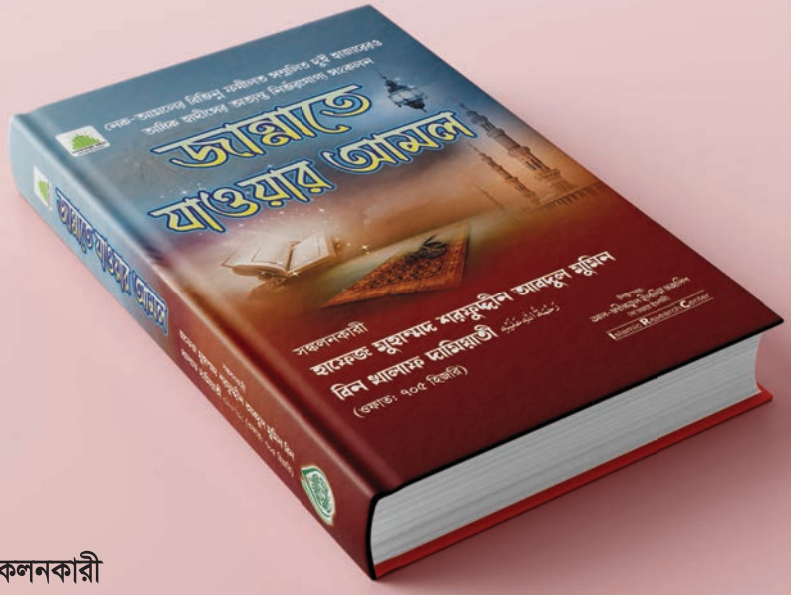
আই প্যাচিংয়ের সময় শিশুর চোখের চশমা লাগিয়ে রাখাও জরুরী হয়ে থাকে, যাতে চোখ ও মস্তিষ্কে মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দু একই ইমেজ (Image) হয়।

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত

নতুন কিতাব

নেক-আমলের বিভিন্ন ফযীলত সম্মলিত দুই হাজারেরও
অধিক হাদীসের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সংকলন

জান্নাতে যাওয়ার আমল



সংকলনকারী

হাফেজ মুহাম্মদ শরফুদ্দীন আবদুল মুমিন বিন খালাফ দামিয়াতী

رَحِمَهُ اللهِ عَلَيْهِ

(ওফাত: ৭০৫ হিজরি)

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়্যা মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net

